।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের ভাষা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রতিদিনের পরিচিত মানুষের কাহিনি বর্ণনা করেছেন প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষাতেই। তৎসম শব্দবহুল সংস্কৃতগন্ধী শব্দ ব্যবহার করে তিনি তাঁর রচনাকে গম্ভীর মন্দ্রে ঝংকৃত করেননি। তিনি সহজ, সরল ভাষাতেই সহজ সরলতায় প্রকাশ করেছেন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ও জটিল মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকে। তাঁর ছোটগল্পের গতি যেমন সাবলীল তাঁর ভাষাও তেমনি উচ্ছ্বাসহীন। তবে পরিস্থিতি, পরিবেশ, ঘটনা ও চরিত্রের মানসিকতা ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তিনি তাঁর গল্পে ভাষা প্রয়োগ করেছেন। বিবৃতির ভাষাকে যেমন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঞ্জনাপূর্ণ করে গড়েছেন, তেমনি সংলাপের ভাষাকেও ইঙ্গিত ও নিহিতার্থের সাহায্যে বহুমাত্রিক করেছেন। ঘরোয়া আটপৌরে মানুষের ভাষা, নিম্নশ্রেণির মানুষের, নিম্নবিত্ত মানুষের ভাষা, আবার অপরদিকে শিক্ষিত সমাজের মার্জিত রুচির মানুষের ভাষা, তাদের সংলাপের পার্থক্য গল্পের বাস্তবতা রক্ষায় যেমন সহায়তা করেছে তেমনি লেখকের মানসিকতাকে পরিস্ফুট করেছে। ফরিদপুরে বাল্য ও কৈশোর কাল কাটাবার ফলে পূর্ববঙ্গের ভাষা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল ফলে পূর্ববঙ্গের গ্রামজীবন কেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলিতে এই পূর্ববঙ্গীয় ভাষার সাবলীল ও বাস্তবগ্রাহ্য ব্যবহার গল্পগুলিকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। নরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রেম ছিল কবিতার প্রতি, তাই তাঁর ছোটগল্পের ভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই এক কবিমনের প্রকাশ ঘটেছে। গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আঙ্গিক প্রকরণের হরগৌরী মিলনে নরেন্দ্রনাথের গল্পের ভাষা ব্যবহার এক অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। কিছু উদাহরণ উদ্ধার করে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্যটি যেমন দেখানো যায়, তেমনি একই সঙ্গে এই ভাষাশিল্পে বৈচিত্র্য আনয়নের কারণ অনুসন্ধান করা যায়।

ভাষায় কাব্যিকরীতি ঃ

১. "আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পর এল বসন্ত, মাজু খাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে।" ('রস')

২. "কী করবে রিনি। সেদিন যে সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছিল। কলকাতা শহরের এই সরু গলির পুরোন ফ্ল্যাট-বাড়িটার জানালা দিয়েও আকাশের মেঘ দেখা যাচ্ছিল; হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ধরা যাচ্ছিল, জলের ছাঁটে

চোখ-মুখ ভিজিয়ে নিতে পারছিল, বাতাসের ঝাপটায় এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল কাগজ-পত্রের সঙ্গে নিজের মনকেও দূর দূরান্তরে উড়িয়ে দেওয়ার সাধ হচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময় সেই বৃষ্টিঝরা, বৃষ্টিভরা সন্ধ্যায় ভদ্রলোক তাদের বাড়ীতে এসেছিলেন।" ('একটি ফুলকে ঘিরে')

৩."……বহির্বিশ্বও যেন এক বৃহৎ গহ্বরের চেহারা নিয়েছে। শীতের কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা। শহরতলীর রাস্তায় আজ কেন যেন আলো জ্বলেনি। আমার ঘরের সামনের দীপদণ্ডটি প্রায়ই নির্বাপিত থাকে। আজ দেখলাম সেই নির্বাপন দণ্ড সবাই মাথা পেতে নিয়েছে।" ('একটি মৃত্যু ও আমি')

এখন দেখা যাক নরেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত ক্ষেত্রগুলিকে ভাষারীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে কাব্যিক রীতির প্রয়োগ করেছেন কেন। প্রকৃতপক্ষে কেবল ফর্ম এবং কনটেন্ট নয় ভাষাও সুনির্দিষ্ট সাহিত্য শাখাকে নির্দিষ্ট করে চিনিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় এই ভাষা সেই নির্দিষ্ট সাহিত্যশাখা বা জাঁর (Genre) টিকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিতও করে তোলে। উপন্যাসের ভাষা থেকে ছোটগল্পের ভাষা হয়তো তার ইঙ্গিতময়তা ও ব্যঞ্জনধর্মীতার বৈশিষ্ট্যেই আলাদা, কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণে বা বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষারীতির প্রয়োগ করেছেন নরেন্দ্রনাথ। কাব্যিক ভাষারীতির উদাহরণে প্রথমে 'রস' গল্পটি থেকে উদাহরণ নেওয়া হয়েছে। এই গল্পে ফুলবানুর বর্ণনায় লেখক কাব্যিক ভাষারীতি প্রয়োগ করেছেন কেন, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই দেখা যায় মোতালেফ একজন সুন্দরী স্ত্রীর প্রত্যাশী কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণে সবচেয়ে বড় বাধা অর্থ। তাই সে সুন্দরের অন্বেষণে থাকলেও এই অন্বেষণ সহজে সফল হয়নি। মোতালেফের এই সৌন্দর্য অন্বেষণকে লেখক বর্ণনা করেছেন এইভাবে— "বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ ক'রে ঘোরে তাঁর চোখ। অল্পবয়সী খুবসুরৎ চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি সাতকুড়ি।" মোতালেফের রোম্যান্টিক রূপমুগ্ধতা ও রূপ অভিলাষ পূরণের অন্তরায়টি নিতান্তই পার্থিব ও শক্তমাটির কাছাকাছি সমস্যা, তাই সেই বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে নিতান্ত বাহুল্য বর্জিতভাবে, কঠোর গদ্যময়তায়। 'দরে পটেনি' শব্দটি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু মোতালেফ ও মাজু খাতুনের যৌথ কঠোর পরিশ্রমে যখন মোতালেফ ফুলবানুকে ঘরে আনবার সামর্থ্য অর্জন করেছে, তখন তার বহুদিনকার অন্তরে লালিত সাধ পূরণের উপায় হয়েছে, তার রূপাভিলাষ পূর্ণ হয়েছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে লেখকের বর্ণনার ভাষা। বর্ণনার ভাষায় এসেছে কাব্যের ছোঁয়া, বিষয়ের মনোহারিত্বকে আরও সৌন্দর্য্যমন্ডিত করেছে সুচারু ভাষাভঙ্গি এক্ষেত্রে প্রকৃতির কাব্যিক বর্ণনা আসলে মোতালেফের অন্তরাত্মার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। মানুষের মনের ছায়াপাত ঘটেছে প্রকৃতির বর্ণনায়, ধ্বনি মাধুর্যের অপূর্ব কাব্যময়তায় "আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পর এল বসন্ত, মাজু খাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের

মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তাঁর নিঃশ্বাসে।"

এইভাবে দেখা যায় দীর্ঘদিন সযত্নে অন্তরে লালিত রূপাভিলাষ যখন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তখন তার বর্ণনায় ভাষারীতিও কাব্যিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এমনভাবেই 'একটি ফুলকে ঘিরে' গল্পে দেখা যায় সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা একটি মেয়ের অন্তরে প্রথম পুরুষ সান্নিধ্যের দিনটির বর্ণনাকেও নরেন্দ্রনাথ কাব্যিক সুষমা মন্ডিত করেছেন । এই গল্পটির কাহিনি অংশ সামান্য। রিনির মায়ের বন্ধু জিতেশবাবুর ঘন ঘন তাদের বাড়িতে আগমন এবং মায়ের সঙ্গে তার দীর্ঘ অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা কখনই রিনির ভালো লাগেনি; বরং "কেমন যেন 'অসভ্য অসভ্য' লেগেছিল।" ভদ্রলোককে সমস্ত দিক থেকেই অতীব সাধারণ মনে হয়েছিল রিনির। বাবার সঙ্গে তুলনায়, রূপে, গুণে, বৃত্তিতে অনেক হীন মনে হয়েছিল, জীতেশ বাবুর চেহারাও অতীব সাদামাটা— "রোগা, ঢাঙা চেহারা। গায়ের রং একটু ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে, মুখখানা গোলও নয়,লম্বাও নয়, বরং একটু যেন চৌকো ।" প্রথমে দর্শনে রিনির মনে হয়েছে — "এ আবার কি রকম মুখ রে বাবা।" তার জীবিকার কথা শুনে মনে হয়েছে— "কি একটা বিদেশী মেডিক্যাল ফার্মের রিপ্রেজেনটেটিভ। মানে একটু উঁচু দরের হকার।" এই ভদ্রলোকের একটি গুনই কেবল রিনি পরবর্তীতে অনুভব করেছে আর তা হল— "ভদ্রলোকের মুখে রূপ না থাকলে কি হবে, কথায় রূপ আছে।" রিনির মনের ভাব ও কাহিনির বর্ণনা লেখক আটপৌরে ভাবেই করেছেন কিন্তু যখন এই অপছন্দের মানুষটিরই প্রথম সান্নিধ্য লাভ করেছে রিনি, তখন তা অতি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তা তার নব জাগ্রত নারীত্বের অনুভূতিকে তৃপ্তি দিয়েছে। নিজের অন্তরে রিনি 'অদ্ভুত এক উল্লাস' অনুভব করেছে। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এই পুরুষের সান্নিধ্য বদলে দিয়েছে সবকিছু। তাই "রোজ বার কয়েক করে যে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে নামে রিনি সেই পুরোন বাড়ির সরু সিঁড়ি বেয়েই নামল, কিন্তু মনে হল যেন পাহাড় থেকে নামছে।" নিজের থেকে অনেক বেশি বয়েস জিতেশবাবুর কিন্তু তবু তার কাছ থেকে ভালোবাসার উপহার পেয়ে রিনির মনের পরিবর্তন হয়েছে, যে ব্যক্তিকে এতদিন নিজের মায়ের রূপমুগ্ধ বলে মনে করে অশ্রদ্ধা করেছে, তার কুরূপতাকে ঘৃণা করেছে সহসা তার কাছ থেকে ভালোবাসার ইশারা পেয়ে মনে হয়েছে সেই রূপমুগ্ধতা নিন্দার্হ নয়। সেই রূপমুগ্ধতার জন্যই রূপহীন ব্যক্তি হয়ে উঠেছে রূপবান— "ভদ্রলোকের মুগ্ধ চোখ দুটি বড় সুন্দর, তাঁর দেওয়া গোলাপটির রঙ এত টুকটুকে লাল, আর তাঁর মুখের সব কথাই তো রূপকথা।" এই মানুষটিকেই আকাঙ্ক্ষা করেছে রিনি আর ভেবেছে, "কিন্তু -কিন্তু তিনি কেন সবদিক থেকে রূপকথার রাজপুত্র হলেন না।" এইভাবে এক উদ্ভিন্ন যৌবনা কন্যার অনুরাগ আকস্মিকভাবে রূপ পেয়েছে একটি সহসা প্রাপ্ত লাল গোলাপের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই অনুরাগের সম্ভাবনা গল্পের মধ্যে যতটা আকস্মিক, সচেতন গল্পের পাঠকের কাছে ততখানি নয়, কারণ জিতেশবাবুর প্রথম আগমনের দিনে রিনির আচরণের বর্ণনার কাব্যিক ভাষারীতি আমাদের গল্পের শেষ সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রদান করেছিল। যদিও গল্পের

অন্যত্র এই কাব্যিক ভাষারীতি অনুপস্থিত। এখানে কাব্যিক ভাষারীতি গল্পের সমাপ্তির সম্ভাব্যতার ইঙ্গিতবাহী — "সেদিন যে সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছিল। কলকাতা শহরের এই সরু গলির পুরোন ফ্ল্যাট-বাড়িটার জানলা দিয়েও আকাশের মেঘ দেখা যাচ্ছিল; হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ধরা যাচ্ছিল, জলের ছাঁটে চোখ-মুখ ভিজিয়ে নিতে পারছিল, বাতাসের ঝাপটায় এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল কাগজ-পত্রের সঙ্গে নিজের মনকে ওর দূর-দূরান্তরে উড়িয়ে দেওয়ার সাধ হচ্ছিল।"

এইভাবে নরেন্দ্রনাথ আটপৌরে গদ্যভাষার মধ্যে কাব্যিক রীতি আনয়ন ক'রে কখনো মোতালেফের ইপ্সিত নারীকে লাভ করবার অনির্ব্বচনীয় আনন্দকে রূপদান করেছেন আবার কখনও কাব্যিক ভাষারীতির প্রয়োগে প্রথম প্রেমানুরাগের অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। তবে নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র রোম্যান্টিকতাকে প্রকাশের ক্ষেত্রেই কাব্যিক ভাষারীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিষাদময়তাকেও এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে 'একটি মৃত্যু ও আমি' গল্পটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই গল্পের কাহিনি অংশ সামান্য বা প্রায় নেই বললেই চলে। একজন অতি স্বল্প পরিচিত মহিলার মৃত্যুতে গল্পকথকের আরও স্বল্প প্রতিক্রিয়া এবং কেবলমাত্র সামাজিক কর্তব্য রক্ষার দায়ে শোক জ্ঞাপন ও পরিশেষে এক শোকার্ত আত্মীয়াকে সমবেদনা জানাবার মধ্য দিয়ে নিজের যান্ত্রিক মনের উপর মানব সত্তার জয়লাভের অনুভূতিতে গল্প সমাপ্ত হয়েছে। কথকের আত্মকথন ও চৈতন্যপ্রবাহের ধারায় গল্পের অগ্রগতি ও সমাপ্তি। এক নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির মৃত্যুতে গল্পকথক হয়তো বাস্তবতার চাপে শোকার্ত হতে পারেননি বা শোকের অনুভূতিকে কঠোর বাস্তবতার দাবীতে হৃদয়ে জাগ্রত করতে পারেননি, কিন্তু গল্পকার সচেতনভাবে গদ্যরীতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর শূন্যতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন - "কিন্তু শুধু আমার ঘরই নয় বহির্বিশ্বেও যেন এক বৃহৎ গহ্বরের চেহারা নিয়েছে। শীতের কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা। শহরতলীর রাস্তায় আজ কেন যেন আলো জ্বলেনি। আমার ঘরের সামনের দীপদণ্ডটি প্রায়ই নির্বাপিত থাকে। আজ দেখলাম সেই নির্বাপন দণ্ড সবাই মাথা পেতে নিয়েছে।" -এইভাবে কেবল ভাষারীতির পরিবর্তনে পরিবেশ রচনার মধ্য দিয়ে চিরবিদায়ের শূন্যতাকে কবিসত্তার অধিকারী ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ রূপ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের 'কেন এল না' কবিতার কথা মনে পরে। যেখানে অন্ধকার, বারুদের গন্ধ আর গলির সংকীর্ণতার ইঙ্গিতে মৃত্যুকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে -

"তারপর অনেক রাত্তিরে
বারুদের গন্ধে ভরা রাস্তা দিয়ে
অনেক অলিগলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে

বাবা এল

ছেলে এল না।"

প্রকৃতি ও পরিবেশ বর্ণনার ভাষা ঃ

১."দু'পাশে পাটের জমি। মাঝখানের আধ হাত খানেক চওড়া আলের রাস্তা। কচি কচি দূর্বা গজিয়েছে আলের ওপর। সাইকেলটি হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে শীতাংশু সদানন্দবাবুর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। সবুজ পাটের চারা গজিয়েছে দুদিকের জমিতে। এখনও হাঁটু অবধি ওঠেনি গাছ। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে নু'য়ে নু'য়ে পড়ছে।" ('ঘুষ')

২."চাঁদের আলো সাদা মোমের মত গলে গলে পড়ছে শহরের ওপর। সমস্ত রাস্তাটা মখমলে ঢাকা।" ('হলদেবাড়ি')

৩."জানালার ফাঁক দিয়ে ঘুমন্ত শহরতলী চোখে পড়ে। নারিকেল গাছগুলোর মাথার ওপর গোল হয়ে উঠেছে চাঁদ। সমস্ত পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে।" ('প্রতিদ্বন্দ্বী')

৪."তেঁতুলগাছের নীচে ছোট একখানা ঘর। ওপরে পুরনো করোগেট টিনের চাল। জায়গায় জায়গায় মরচে ধরেছে। বেড়াগুলির খানকয়েক বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি, সামনের খান-দুই পাঁকাটির। মাটির ভিত বর্ষার জলে থিক থিক করছে। মাটি খুঁড়ে গোটাকয়েক কেঁচো আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে ভিতরে। সামনে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে ছোট একটু উঠোন। খালের জল বাড়ির উপর উঠি উঠি করছে। এখনো ওঠেনি। ('পালঙ্ক')

৫."গতবারের মত এবারও আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে বর্ষার জল দারুণ বাড়তে শুরু করল। মাঠ ময়দান আগেই তলিয়েছিল। এবার জল এগুতে এগুতে খালের ঘাটের সবগুলি পৈঠা ছাড়িয়ে মল্লিকদের বাঁশ-বাগানের আম-বাগানের ভিতর দিয়ে আইনুদ্দিন শেখের উঠানের ওপর এসে দাঁড়াল। প্রথমে পায়ের পাতা ভেজে কি না ভেজে, তারপর জল গিরা পর্যন্ত উঠল।" ('বন্যা')

৬."সীমান্তের এই ছোট্ট শহরটি যেমন দরিদ্র তেমনি অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার সমস্ত কুশ্রীতা ঢাকা পড়েছে। সামনের দিগন্ত-ছোঁয়া শস্যহীন শূন্য মাঠকে মনে হচ্ছে স্তব্ধ সমুদ্রের মত।

ছাদটি সত্যিই বেশ বড় । চারদিক আলসে দিয়ে ঘেরা। ওপরেও একটি সুন্দর ঘেরাটোপ আছে। তারায় ভরা সুন্দর স্বচ্ছ আকাশ। জরীর কাজ করা নীলাম্বরী শাড়ির মত।" ('চিলেকোঠা')

প্রকৃতির সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সংযোগ সুদৃঢ়। বাল্য ও কৌশোরকাল পূর্ববাংলার গ্রামে অতিবাহিত

করায় প্রকৃতির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। গ্রাম জীবনের সেই অভিজ্ঞতা, গ্রাম্যপথ, গাছপালার গন্ধ, নদী, নালা, খাল, বিল পরিপূর্ণ পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি তাঁর প্রথম দিককার ছোট গল্পে অনুপুঙ্খ বাস্তবতায় উঠে এসেছে।

তিনি মূলত মানব মনের বিশ্লেষক আর এই বিশ্লেষণ কর্মে অগ্রসর হয়ে তিনি প্রকৃতির চিত্রণকেও কাজে লাগিয়েছেন। প্রকৃতির চিত্রণে শুধু প্রকৃতির প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসাই প্রকাশিত হয়নি, সেই প্রকৃতি কখনও হয়ে উঠেছে মানব মনের অকথিত বাণীর শিল্পরূপ। কখনও এই প্রকৃতিচিত্র বর্ণিত হয়েছে মানব মনের ভাবনার সমান্তরালে, কখনও বিপরীত স্রোতে আর এই প্রকৃতি বর্ণনার ভাষারীতিও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে।

প্রকৃতিতে মানবমনের মত গূঢ়ৈষণা নেই, ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টিভঙ্গী নেই, যন্ত্রণার দহন ব্যাকুলতাও নেই। কিন্তু সেই প্রকৃতি কখনও হয়ে উঠতে পারে মানব মনের, মানুষের মানসিক অবস্থার প্রকাশক, আবার কখনও তা হয়ে উঠে তাপিতের সান্ত্বনা প্রদানকারী উপশমকারী প্রলেপ, যা যন্ত্রণার তীব্রতাকে, দহনকে নির্বাপিত করে। কখনও প্রকৃতি মানবের মানসিক অবস্থার বিপরীত মেরুতে দাড়িয়ে সেই মানসিকতাকে বৈপরীত্যের আলোকে উজ্জ্বল করে। নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতি চিত্রণের ভাষাকে উদ্ধার করে তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে। 'ঘুষ' গল্পটির প্রারম্ভেই আছে প্রকৃতির বর্ণনা কিন্তু সেই বর্ণনা কোনো অরণ্য, নদী বা পাহাড়-পর্বতের বর্ণনা নয়, নিতান্তগ্রামবাংলার চাষের জমির বর্ণনা কিন্তু তা লেখকের বর্ণনার গুণে চমৎকার একটি ছবি রচনা করেছে— "দুপাশে পাটের জমি। মাঝখানের আধহাত খানেক চওড়া আলের রাস্তা। কচি কচি দূর্বা গজিয়েছে আলের ওপর। ..... সবুজ পাটের চারা গজিয়েছে দুদিকের জমিতে। এখনও হাঁটু অবধি ওঠেনি। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে নু'য়ে নু'য়ে পড়ছে।" — এখানে দেখা যায় এই প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক কল্পনার ঘোড়ায় চেপে আকাশচারী হননি, এই বর্ণনায় অতিকথন নেই, বর্ণনার বাড়াবাড়ি নেই বরং সংযম আছে কিন্তু তাতে সৌন্দর্যের হানি ঘটেনি। এক্ষেত্রে দেখা যায় গল্পের অন্যান্য অংশের তুলনায় লেখক এখানে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট বাক্য রচনা করেছেন, যেন পাঠকের চোখে ছোট ছোট ছবি এঁকে একটি বড় পটভূমিতে স্থাপন করবেন। এখন দেখা যাক এই প্রকৃতি বর্ণনা গল্পের ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। 'ঘুষ' গল্পটির প্রধান চরিত্র শীতাংশু জুট-রেজিষ্ট্রেশন অফিসে চাকরী করে। বরাদ্দ জমি অপেক্ষা বেশি জমিতে কোন কৃষক পাট চাষ করছে কিনা এ বিষয়ে তদন্ত ও তদারক করাই তার কাজ। এক আসন্ন ঝড়-বাদলের সন্ধ্যায় তার দূরসম্পর্কের কুটুম্ব সদানন্দ গাঙ্গুলি যখন তাকে আপ্যায়ন করে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে তখন তার বাড়িতে যাবার পথেই এই চাষের ক্ষেতের বর্ণনা রয়েছে। গ্রাম বাংলার কৃষি নির্ভর সমাজের এই অতি পরিচিত ছবি শীতাংশুকে মুগ্ধ করেনি, অনির্বচনীয় প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণে উদ্দীপিত করেনি। বরং তার মনে হয়েছে উপযুক্ত

পারিতোষিক না পাওয়ার জন্য দু'তিনখানা বড় বড় জমি বে-আইনি চাষের জন্য সে ভেঙে ফেলতে হুকুম দিয়েছে, সেই জমিগুলোর পাট এই জমির চেয়েও বড় এবং ঘন ছিল। অর্থাৎ এখানে প্রকৃতি কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে না, তা বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ মানুষের মনে বিশেষ অনুভূতিকে সঞ্চারিত করেছে। দমকা হাওয়ায় হাটু অবধি ওঠা কচি পাটের গাছের নুয়ে পড়া যেন প্রবল প্রতাপান্বিত সরকারী কর্মচারীদের দয়ায় বেঁচে থাকবার জন্য নিরন্তর সংগ্রামকারী পাটচাষীদেরই প্রতিভূ, যাদের উচ্চতা ও মানও বেশি নয়, কেবল হাটু পর্যন্ত আর দমকা হাওয়ায় এদের চিরকালই নুয়ে পড়তে হয়। শীতাংশুর মনের ভাবনা এখানে প্রকৃতি বর্ণনার এই ভাষারীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, কারণ শীতাংশু চলছে আর ভাবছে, কিন্তু সেই ভাবনা টুকরো টুকরো, গভীর নয় তাই প্রকৃতি বর্ণনার বাক্যগুলিও ছোট ছোট যা ভাবনার সবিরামতাকেই সূচিত করে। অপরদিকে সদানন্দবাবুর জীর্ণ বাড়িতে দারিদ্র্য থাকলেও অন্য এক আকর্ষণও আছে— তার কন্যা কুন্তলা। তাই সদানন্দবাবুর বাড়ির সামনের আগাছার বর্ণনা আছে, অপরিস্কার পুকুরের বর্ণনা আছে, আর আছে এই ছোট ছোট বাক্যগুলির মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বাক্য, যা সোজা আগাছার জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে বাড়ির অন্দরে ও একই সঙ্গে হয়তো কারও অন্তরে প্রবেশের পথের বর্ণনা দেয়— "বাড়ির সামনে একটি পানাভরা মজা পুকুর। চারপাশ থেকে নানা আগাছার জঙ্গল ঝুঁকে পড়েছে। ভালর মধ্যে দু'-একটা আম আর খেজুর গাছ আছে মাঝে মাঝে। পুকুর পারের সেই আগাছার ভিতর দিয়েই সরু সাদা একটু পথ কুমারীর সিঁথির মতো সোজা হয়ে একেবারে বাড়ির উঠোনে গিয়ে পৌঁচেছে।"

কেবল কৃষিনির্ভর বাংলার পল্লীপ্রকৃতির চিত্রাঙ্কন নয়, শহর কলকাতার নগরের সৌন্দর্যকেও সমান দক্ষতায় বর্ণনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ। 'হলদেবাড়ি' গল্পে লেখক জ্যোৎস্নালোকিত শহরের সৌন্দর্যকে যথাযথ নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন আর সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে, তরল চন্দ্রালোকের সঙ্গে তুলনা করেছেন গল্পের নায়িকা অঞ্জনাকে। তবে এই গল্পে প্রকৃতি বর্ণনার মূল কারণ ভিন্ন। অকৃপণ জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে সমগ্র শহর যখন মায়ানগরীতে পরিণত হয়েছে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে, মারী ও মন্বন্তরের আঘাতে অসহায় মানুষের ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামও অব্যাহত রয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের ডাস্টবিন থেকে খাদ্য সংগ্রহের সংগ্রাম চলছে অবিরত। এই একই সময়ে দেশের উচ্চবিত্ত সমাজ তাদের নিজের শহরের অভুক্ত জীর্ণ মানুষগুলির প্রতি নিস্পৃহ থেকেছে। তাদের কেউ রচনা করেছে যুদ্ধের বই, কেউ বা সৌন্দর্যের পূজারী সেজে এই মূর্তিমান অসুন্দরদের ঘৃণা ক'রে । তাদের দূরে ঠেলতে গিয়ে এই সৌন্দর্যের পূজারীরা হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত। এই কারণে প্রকৃতির চিত্রণ এখানে ভিন্ন মাত্রা নিয়েছে। এখন গল্প থেকে কিছু অংশ উদ্ধার ক'রে প্রকৃতির রূপ বর্ণনার ভাষারীতিকে দেখানো যেতে পারে— "চাঁদের আলো সাদা মোমের মত গলে পড়ছে শহরের ওপর। সমস্ত রাস্তাটা মখমলে ঢাকা ।" এছাড়া গল্পের অন্যত্র একই কারণে প্রকৃতি বর্ণনার চিত্র প্রকাশিত— "দু'পাশের বাড়িগুলি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্নায় ভিজে উঠেছে। কিন্তু বর্ণ গন্ধ

ধ্বনি ভরা এই পরিচিত পৃথিবী ওদের কাছ থেকে যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সব কিছুতে মিলিয়ে আছে শুধু একটা অশরীরী সৌরভ, বহুদূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট সেতারের মধুর একটা টান।"

যেহেতু 'ঘুষ' গল্পের প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে 'হলদেবাড়ি' গল্পের প্রকৃতি বর্ণনার উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তাই এই দুই ক্ষেত্রে ভাষারীতির ক্ষেত্রে এসেছে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য। 'ঘুষ' গল্পের প্রকৃতির বর্ণনা নিতান্ত বাস্তবগ্রাহ্য। এই বাস্তবগ্রাহ্যতা গল্পের পাঠকের কাছে যেমন তেমনি তা গল্পের চরিত্রদের কাছেও সমান কিন্তু 'হলদেবাড়ি'র প্রকৃতির বর্ণনা বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করার, তাকে অস্বীকার করার। তাই তাতে যুক্ত হয়েছে কল্পনার ছায়া, কল্পনার মায়া। 'ঘুষ' গল্পের প্রকৃতি বর্ণনার গদ্যময়তা তাই 'হলদেবাড়ি' —তে এসে পরিবর্তিত হয়েছে, এই কারণে এখানে রাস্তা চাঁদের আলোতে মখমলে আবৃত হয়েছে বাস্তবতার পিচে ঢাকা থাকেনি। যদিও কল্পনায় মোড়া প্রকৃতিও বাস্তবতার আঘাত থেকে দূরে থাকেনি। বৃহৎ এই জ্যোৎস্নার সমুদ্রে এক কদাকৃতি কুমীরের পিঠ অঞ্জনা দেখতে পেয়েছে, যা আর কিছুই নয়— "রাস্তা থেকে কয়েক হাত দূরে গলির মধ্যে ডানদিকে বড় একটা ডাস্টবিন । তারই ভিতর আকণ্ঠ ঝুঁকে পড়ে একটা লোক দু'হাতে কি ঘাঁটছে, তার পিঠটা কেবল দেখা যাচ্ছে।" এই বাস্তবতার আঘাতে স্বপ্ন মেদুরতা ভেঙে গিয়েছে। বাস্তব কখনও ভাঙে না, তা আবৃত থাকলেও একসময় না একসময় প্রকাশিত হয়, কিন্তু কল্পনা ভেঙে যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য বাস্তব তা ভাঙবার নয়, কিন্তু কল্পনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কল্পনা অংশ খসে যেতে পারে মুহূর্তে, তাই এই ক্ষেত্রে প্রকৃতি বর্ণনার ভাষারীতিও হয়ে পড়ে ভিন্ন, স্বপ্নমেদুরতা ও কল্পনার কুহক জালে আবৃত ও সজ্জিত— "তিন চার মিনিটের মধ্যে বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থামল। জ্যোৎস্নার সমুদ্রে সাদা একখানা জাহাজ নোঙর ফেলে রয়েছে। আসলে রঙ এই জাহাজী প্যাটার্ণের বাড়ি খানার সাদা নয়, হাল্কা হলদে। রাত্রে এমন দেখাচ্ছে।"

পূর্বে উদ্ধৃত 'পালঙ্ক' গল্পে দেখা যায় প্রকৃতি বর্ণনা যেন মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী হয়ে দেখা দিয়েছে। লেখক মকবুলের বাসস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন— "খালের জল বাড়ির উপর উঠি উঠি করছে। এখনো ওঠেনি।" এ যেন মকবুলের বর্তমান পরিস্থিতি, তার দুর্ভাগ্য, দারিদ্র্য ও অসহায়তার বর্ণনা ও ভবিষ্যতের চরম দুর্দিনের ইঙ্গিত। মকবুল ধলাকর্তার পালঙ্ক ক্রয় করে নিজের আর্থিক অবস্থাকে সর্বনাশের শেষ প্রান্তে এনে উপস্থিত করেছে। তার ঘরের দুয়ারে সর্বনাশ এসে দাড়িয়েছে, তাই খালের জলও বাড়ির উপর 'উঠি উঠি করছে'। কিন্তু নিজের জেদ, সাহস ও পুরুষকারের জোরে মকবুল নিজেকে, নিজের পরিবারকে রক্ষা করবার প্রাণপণ প্রয়াস করে চলেছে ও ভাঙনের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হলেও ভেঙে পড়েনি, তাই খালের জলও তার বাড়িতে 'এখনো ওঠেনি'। কিন্তু 'এখনো ওঠেনি' এই বাক্যটির আকৃতিগত ক্ষুদ্রতা যেন আমাদেরকে ইশারা করে যে আর বেশিদিন মকবুল নিজের জেদকে বজায় রাখতে পারবে না, অচিরেই তার প্রতিরোধ ভেঙে পড়বে, সে তার সখের পালঙ্ককে ধলাকর্তার বাড়িতে

ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। হয়তো খালের জলও তার বাড়িকে গ্রাস করবে। এইভাবে লেখক প্রকৃতির বর্ণনা দ্বারা গল্পের বক্তব্যকে ইঙ্গিতবাহী করে তুলেছেন, বাক্যের দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতাও এই ইঙ্গিতময়তায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

নারীরূপের চিত্রাঙ্কন ঃ

১."টুকু লজ্জিত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। ভারি সুন্দর রঙ ওর। লজ্জা পেলে ওর সিঁথির সিঁদুর যেন সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। মুখের ডৌল ভারি মিষ্টি। ছোটখাটো চেহারা। টুকু যেন এখনো এতটুকু। পুতুলের মত নরম তুলতুলে। কিন্তু দেখ, এত অল্প বয়সেই কেমন মা হয়ে গেছে। পুতুল হয়েছে পুতুলের মা।"('মাধবী মঞ্জরী')

২."একটু বাদে চায়ের কাপ এনে অঞ্জলী টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে একটু সরে দাঁড়াল। এই মাত্র উনুনের কাছ থেকে উঠে এসেছে। আগুনের আঁচ লেগেছে মুখে, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আটপৌরে কালোপেড়ে শাড়িখানার আঁচল কোমরে জড়ানো। আঙুলগুলিতে ঈষৎ হলুদের ছোপ। তবু এই বেশে ভারি সুন্দর মনে হল অঞ্জলিকে, ভারি নতুন লাগল। আর কোন মেয়ের সুগৌর ছোট কপালে ঘামের বিন্দুও যে এমন নয়নাভিরাম হয়, তা আমি এই প্রথম লক্ষ্য করলাম।" ('অসবর্ণা')

৩."পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি বউ তাদের একেবারে দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরণে নীল পেড়ে খাটো শাড়ি। আঁচলে মাথার সবটুকু ঢাকেনি। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ, কপালে ছোট্ট সুগোল ফোঁটা। দু'-হাতে দু'গাছা মোটা মোটা শাঁখা, আর গাছ দুই ক'রে কাঁচের চুড়ি। দেখলেই বোঝা যায় নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থঘরের বউ। গায়ের রঙ ময়লা, চেহারাও একটু রোগাটে। কিন্তু ওরই মধ্যে মুখে বেশ একটু লক্ষ্মীশ্রী আছে। নাক চোখ তেমন চোখা-চোখা না হলেও মুখের গড়নটুকু ভারি মোলায়েম, কথা বলবার ধরণটুকুও বেশ মিষ্টি।" ('দ্বিচারিণী')

৪."গলির মোড়ে আধো আলো আধো ছায়ার রহস্য কুহেলীতে যাকে মনে হয়েছিল বিশ বাইশ বছরের তরুণী, তার বয়স যে চল্লিশের কম নয় তাতে তারাপদর কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। মুখ ভরা মেচেতার দাগ, তোবড়ানো গাল, কোঁচকানো চামড়া। পাউডারের পুরু প্রলেপেও সব কুশ্রীতা ঢাকা পড়েনি। লিপস্টিক মাখা ঠোঁটের ফাঁকে পানের রসে কালো, বিবর্ণ, ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে।" ('সমব্যথী')

৫."এই মেয়েটির নাকে অবশ্য নাকছাবি নেই, কিন্তু সমস্ত মুখে স্থূল সারল্যের সঙ্গে অদ্ভুত একটু

চতুর মনোভাবের ঢং মিশান রয়েছে। তা যেমন হাস্যকর তেমনি অশ্লীল, মেয়েটি যেন ইতিমধ্যেই জগৎরহস্যের পার দেখে ফেলেছে। পুরুষের স্বভাব, মেয়েদের সম্বন্ধে তার সমস্ত বাসনা কামনার স্বরূপ কিছুই ওর জানতে বাকি নেই।" ('স্বখাত')

৬."চোখের সামনে সেই উলঙ্গ অনাবৃত নারী-দেহ। হঠাৎ এই রকম আর একটা অসহায় দেহ মনে পড়ে গেল। কিন্তু এ যে আরো দুঃসহ, আরো কুশ্রী, আরো কদর্য। শাড়ি পরবার ধরণে যাকে আঠার উনিশ বছরের যুবতী বলে মনে হয়েছিল, অনাবৃত দেহে তার শিথিল চর্ম প্রৌঢ়ত্ব বেরিয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় সর্বাঙ্গে চাকা চাকা ক্ষতচিহ্ন, বুকের উপর বিকৃত, বিস্তীর্ণ দুটি মাংসপিণ্ডের মাথায় বড় বড় দুখানা ঘা থকথক করছে।" ('আবরণ')

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছিল এক কবিমন। কবিমনের অধিকারী এই লেখক নিজে বলেন যে উপন্যাস ও প্রচুর ছোটগল্প রচনা করলেও কবিতা লিখতেই তিনি সর্বাধিক আনন্দ লাভ করতেন। কবিতা রচনাতেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্বতস্ফূর্ত বিকাশ ঘটত এবং তিনি নির্মল আনন্দের জগতে মুক্তি পেতেন। ছোটগল্প যদিও গদ্য শ্রেণির রচনা তথাপি নরেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গী ও ভাষারীতিতে কবি মনের প্রকাশটি অন্তর্বাহিনী হয়ে বিরাজ করে। তার এই মানসিকতার যথার্থ প্রকাশ ঘটে প্রকৃতি বর্ণনায় ও নারীরূপের চিত্রাঙ্কনে । নারীর রূপ চিত্রণে নরেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর গল্পে নারীদের একটি উত্তরণ চোখে পড়ে। তাঁর গল্পে নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে কর্মের জগতে প্রবেশ করেছে, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ চরিত্রদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে নিজের স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে— যে বিষয়গুলি একটু ভিন্ন মনোযোগের দাবী করে। তাঁর গল্পে বিভিন্ন প্রকার নারীরা উঠে এসেছে, তারা কখনো কিশোরী, কখনো বালিকা, কখনও বা যুবতী, বিবাহিত স্ত্রী, বয়স্কা পরিবারের প্রধানা, কখনও বা সমাজের নিম্নশ্রেণির মহিলা, কখনওবা নীচ বা হীন বৃত্তি গ্রহণকারী পতিতা। এদের প্রত্যেককেই তিনি তাদের নিজের নিজের স্থানে নিজ নিজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের পটভূমিকায় যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন। নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে যথাযথ ভাবে পাঠ করলে একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে, তা হল, যে গল্প গুলিকে তিনি কথকতার ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন সেই গল্পগুলিতে তো বটেই অন্য গল্পগুলিতেও কোন চরিত্রকে উপস্থাপন করলেই স্বল্প পরিসরে হলেও সেই চরিত্রের চেহারা বা আবির্ভূত স্বরূপের একটি বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এই বর্ণনা দ্বারা যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেন তাতে চরিত্রটি আমাদের সামনে ছবির মতো প্রতিভাত হয়। কখনও এই বর্ণনা কেবল চরিত্রের বহিরঙ্গ বর্ণনাতেই সীমিত থাকে, কখনও সেই বর্ণনা চরিত্রটির মানসিকতাকে আমাদের সামনে উদঘাটিত করে। নারীরূপের চিত্রাঙ্কনে কখনও বিপরীত মানসিকতা প্রকাশিত, কখনও বা পুরুষের চোখে সেই নারীরূপের বর্ণনা দিয়ে প্রথম অনুরাগ সঞ্চারের পটভূমি প্রস্তুত হয়। নারীরূপের চিত্রাঙ্কনে নারীর দেহমনের পরিচয় পাই, কখনও পাই তার রোম্যান্টিক মনের পরিচয়,

কখনও পাই কঠোর বাস্তবগ্রাহ্য রূপের পরিচয়। এই রূপ কখনও পুরুষকে শান্তি ও সান্ত্বনার শীতল স্পর্শ দান করে, কখনও কামনা-বাসনায় দুর্মর করে তোলে, কখনও টেনে নিয়ে যায় পাপের পথে, কর্দম পঙ্কিলতায়। বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন বৃত্তির, বিভিন্ন ধারার নারীর চরিত্র বা রূপ অঙ্কনে নরেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষারীতির ক্ষেত্রেও স্বল্প কিন্তু সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়েছেন যার ফলে বর্ণনার ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে নারী চরিত্রগুলির ভিন্নতার দিকেও সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। 'মাধবী মঞ্জরী' গল্প থেকে উদ্ধৃত প্রথম উদাহরণটির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে— "টুকু লজ্জিত হয়ে মুখ ফেরাল। ভারি সুন্দর রঙ ওর। লজ্জা পেলে ওর সিঁথির সিঁদুর যেন সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। মুখের ডৌল ভারি মিষ্টি। ছোটোখাটো চেহারা। টুকু যেন এখনো এতটুকু। পুতুলের মত নরম তুলতুলে।....." এই ছবিটি দেখলেই বোঝা যায় নারীটিকে যে চোখ দিয়ে দেখা হচ্ছে তা প্রেমিকের চোখ নয়, স্নেহ ভালোবাসাপরায়ণ কোনো ব্যক্তির চোখ দিয়ে টুকুর রূপটি ধরা পড়েছে। 'পুতুলের মত নরম তুলতুলে'— এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় দর্শক পুরুষও নন বরং সমবয়েসী বন্ধুস্থানীয় কেউ। কিন্তু যখন 'অসবর্ণা' গল্পে নায়কের সামনে নায়িকার আগমন ঘটেছে তখন তার রূপের বর্ণনায় স্পষ্টতই ধরা পরে এক মুগ্ধ পুরুষের দৃষ্টি— "এইমাত্র উনুনের কাছ থেকে উঠে এসেছে। আগুনের আঁচ লেগেছে মুখে, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আটপৌরে কালোপেড়ে শাড়িখানার আঁচল কোমরে জড়ানো। আঙুলগুলিতে ঈষৎ হলুদের ছোপ। তবু এই বেশে ভারি সুন্দর মনে হল অঞ্জলিকে, ভারি নতুন লাগল। আর কোন মেয়ের সুগৌর ছোট কপালে ঘামের বিন্দুও যে এমন নয়নাভিরাম হয়, তা আমি এই প্রথম লক্ষ্য করলাম।"

স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় এই দুই নারীরূপের বর্ণনায় সুস্পষ্ট ভাষারীতির পার্থক্য আছে। প্রথম দৃষ্টান্তটিতে ছোটো ছোটো বাক্য রচনা করে একটি বিবাহিত মেয়ের রূপ সমবয়েসী আরেকটি মেয়ের চোখে কীরূপে ধরা পড়েছে তার পরিচয় পরিস্ফুট। নতুন মা হবার আনন্দ ও মুক্তিতে সে রূপ উজ্জ্বল, আবার একজন বন্ধুস্থানীয় অবিবাহিতা সমবয়স্কা আত্মীয়ার সামনে কম বয়সেই বিয়ে ও মা হবার জন্য সে যেন একটু লজ্জিতও হয়ে পড়েছে। রাঙা মুখ তাই সিঁথির সিঁদূরের রঙ লাভ করেছে লজ্জায়। অপরপক্ষে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে নারীর রূপ বর্ণিত হয়েছে মুগ্ধ পুরুষের দৃষ্টিতে, প্রেমিকের দৃষ্টিতে। তাই সেই বর্ণনা অনুপুঙ্খতা নিয়ে উপস্থিত। অতি সাধারণ ছবি, অতি সাধারণ দৃশ্য তবুও তা নয়নাভিরাম হয়ে দেখা দিয়েছে। আগুনের আঁচে রাঙা হওয়া মুখ, কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম, আটপৌরে কালো পেড়ে শাড়ি আর আঙুলে ঈষৎ হলুদের ছোপ— এসব নিয়ে একটি গৃহকর্মরতা মেয়ের সাধারণ বর্ণনা; কিন্তু প্রিয়ার রূপ প্রেমিকের চোখে অসাধারণত্ব লাভ করেছে নব অনুরাগে রঙিন হয়ে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই নারীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, প্রথম জনের মুখ রাঙা হয়েছে লজ্জায়, দ্বিতীয় জনের উনুনের তাপে, কিন্তু সেটিও আসলে নব অনুরাগে অনুরাগিনীর রঙিন মনকেই প্রকাশ করেছে।

'মাধুরী মঞ্জরী' বা 'অসবর্ণা' গল্পে নরেন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন নারীর সুরূপের বর্ণনা; কিন্তু কখনো কখনো নারীর কুরূপের বর্ণনাও রয়েছে তাঁর রচনায়। 'নাম' গল্পটিতে 'রসো' চরিত্রটির বর্ণনা করেছেন লেখক তাঁর স্বভাবসিদ্ধভঙ্গিতে— "বছর তিরিশেক হবে বয়স। লম্বা ছিপছিপে একটি গাবের চারার মত চেহারা। কোনো অঙ্গে যে বিশেষ রকমের খুৎ আছে তা নয় কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনো রকম সামঞ্জস্যই যেন নেই। অত বড় মুখে নাক এবং চোখ দুটিকে ভারি ছোট মনে হয়। দেহের তুলনায় হাত দুখানিও খুব খাটো এবং নিচের অংশ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রকমের লম্বা। চেহারায় পুরুষালি ধরণটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আসলে ও যেন মেয়ে নয়, মেয়ে সেজে এসেছে এবং সাজটা সম্পূর্ণ করার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই।"

এমনই এক পুরুষালি মহিলার রূপের বর্ণনা আমরা প্রায় একই রকমভাবে পাই নরেন্দ্রনাথের সমকালীন আর এক গল্পকার সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে। 'সুন্দরম' গল্পে সুকুমারের জন্য পাত্রী নির্বাচনের সময় সত্যদাসের মেয়ে মমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে সুবোধ ঘোষ লেখেন— "মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে সন্দেহ নাই। ঘুটঘুটে অমাবস্যার মত ঘনকৃষ্ণ গায়ের রং। সমস্ত অবয়বে সুপেশল কাঠিন্য মণিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত অস্থিসজ্জা আর হাতপায়ের রোমঘন পারুশ্য পুরুষকেও লজ্জা দেয়। চওড়া করোটির ওপর অতিকুঞ্চিত স্থূলতত্ত্ব চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর স্নিগ্ধ মেঘ-স্তবকের মত। এক দৃঢ়া দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্তি।" এ হেন রমণীর দৃষ্টিপাতেরও বর্ণনা দিয়েছেন লেখক— "বরমালাকাঙাল অবলার দৃষ্টি এ নয়; বরং এক অকুতোলজ্জা স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসাই যেন জ্বল্‌জ্বল্ করছে।"

'নাম' ও 'সুন্দরম' এই দুই গল্পের ক্ষেত্রেই দুই লেখক নারী রূপে কুরূপতার কথা, বিশেষ করে নারীরূপে পুরুষালি ভাবের আধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে উভয়ের ভাষারীতিতেই যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুবোধ ঘোষ চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন একের পর এক উপমার দ্বারা, আর তাঁর বর্ণনায় সংযোজিত শব্দসমূহ তৎসম বা তৎসমগন্ধী এবং তাঁর বর্ণনায় ব্যঙ্গের দিকটিই আভাসিত। 'নীলগিরির চূড়ার ওপর স্নিগ্ধ মেঘস্তবক' বা 'রোমঘন পারুশ্য' প্রভৃতি শব্দ বা বাক্য ব্যবহারে হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। এছাড়া কেবল তৎসমগন্ধী শব্দ ব্যবহারই নয় বিশেষণ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি লিঙ্গভেদ করেছেন, যেমন দৃঢ়া, দ্রাবিড়া ইত্যাদি। অপরদিকে নরেন্দ্রনাথ একই রকম পুরুষালি ধাঁচের নারীর চিত্র অঙ্কন করেছেন, কিন্তু সেই চিত্রাঙ্কন অনেক সংযত। ব্যঙ্গের দৃষ্টি সেখানে প্রধান হয়ে ওঠেনি বরং সমবেদনার দৃষ্টিই যেন খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর ভাষাও চলিত ভাষা, তৎসমগন্ধী শব্দ ব্যবহারের নাম গন্ধও নেই। তিনি উপমাও গ্রহণ করেছেন সহজ, সরল, বলেছেন— "লম্বা ছিপছিপে একটি গাবের চারার মত চেহারা।"

এখন দেখা যাক এমন একটি নারী চরিত্রের রূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য কী? প্রকৃতপক্ষে চেহারা সর্বদা মনের পরিচয়বাহী নয়। নারীর নারীত্ব তার পুরুষালি চেহারায় ঢাকা পড়েনা, চেহারায় লালিত্য, সুষমা বা কমনীয়তা না থাকলেও নারীর নারীসুলভ মানসিকতা বিনষ্ট হয় না। 'নাম' গল্পে দেখা যায় রসোর মত

আপাতদৃষ্টিতে এক অ-নারীর প্রতিও কুঞ্জ কবিরাজ আকর্ষিত হয়েছে। পুত্র-কন্যাহীন বিপত্নীক কবিরাজ রসোর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে অন্ধকারে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু রসো-বৃদ্ধ কবিরাজকে তার বাসনা চরিতার্থ করতে দেয়নি। লণ্ঠনের গরম চিমনির ছ্যাকায় বৃদ্ধের গাল পুড়িয়ে দিয়েছে, হাতের কব্জি মুচড়ে দিয়েছে, হিড়হিড় করে টেনে এনেছে বাড়ির মধ্যে। কুঞ্জ কবিরাজের এই দেহবাসনাকে সবাই অস্বাভাবিক বলে মনে করেছে। সবার মনেই প্রশ্ন জেগেছে— "রসো সম্বন্ধে এমন ভুল, এমন মোহ, তাঁর হ'ল কি ক'রে? রসোর অন্তরে বাহিরে সত্যিই কি নারীত্ব ব'লে কিছু আছে?" প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নটিই গল্পের মূল। যে নারীর চেহারা পুরুষালি, কণ্ঠস্বর কর্কশ, কথাবার্তার ধরণ ধারণ, আচার আচরণ, কাজকর্মের ধরণ, বেশবাশ সবই পুরুষালি বা বলা যায় নারীসুলভ নয়, তার অন্তরে-মনে নারীত্বের স্থান আছে কী না, এই প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তরেই গল্পের পরিসমাপ্তি। কুঞ্জ কবিরাজকে ঘৃণাবশতঃ রসো প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু এই বৃদ্ধই রসোকে যথার্থ নারীর মর্যাদা হয়তো দেয়নি কিন্তু তার নারীত্বকে স্বীকার করেছে। অপরদিকে রসোও সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় কুঞ্জ কবিরাজকে যথাযথভাবে তিরস্কার ও নিগ্রহ করেছে বটে কিন্তু রসো তার নারীত্বের স্বীকৃতিও সেই কুঞ্জু কবিরাজের কাছ থেকেই লাভ করেছে। গল্পের শেষাংশে দেখি, বসন্তের টীকা দিতে যখন স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মীরা এসেছে, তখন তাদের খাতায় সবাই তাদের ডাক নামের পরিবর্তে ভালো নাম নথিভুক্ত করেছে, সেই সময় রসোর পালা এলে সে তার 'রসো' নাম না বলে বলেছে, তার নাম 'রসমঞ্জরী'। এই রসমঞ্জরী নামেই কুঞ্জ কবিরাজ তাকে সেই রাতে ডেকেছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে রসো তার আকৃতিতে, আচার, আচরণে যেমনই হোক না কেন, তার অন্তরে নারীত্বের ধারা প্রবহমান, কুঞ্জ কবিরাজের দ্বারা সে যেন সেই নারীত্বের স্বীকৃতিই লাভ করেছে। মানুষের বাহ্যিক আকৃতিই সব নয়, বাহ্যিক রূপ দেখে তার অন্তরকে বিচার করা যায়না— এই সত্যটিই গল্পে উদ্‌ভাসিত আর এই সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্যই 'রসো'—এর রূপ বর্ণনার প্রয়োজন ছিল। অতএব দেখা যায় নারীর রূপের চিত্রাঙ্কন ও তার ভাষারীতি গল্পের মূল উপজীব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক যুক্ত। শুধু তাই নয় এই বর্ণনা লেখকের সচেতন প্রয়াসও গল্পের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

সংলাপ রচনায় কুশলতা ঃ

১. "বিজন বলল, 'কী যে বলেন, ত্রুটি আবার কিসের ?'
মিসেস রায় বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় আসুন আমার বাড়িতে।'
বিজন বলল, 'কেন, কাল কি কোন অনুষ্ঠান আছে ?'
স্মিতা বলল, 'বিনা অনুষ্ঠানে আপনি বুঝি কোথাও যান না ?'

মিসেস রায় বললেন, 'আপনার যাওয়াটাই তো একটা অনুষ্ঠান।'

তবু বিজন জিজ্ঞাসা করল, 'আর কাউকে কি বলেছেন?'

স্মিতা বলল, 'আপনি কি দলবল ছাড়া একা কোথাও যান না?' " ('আংটি')

২. " 'আচ্ছা, আপনি কি করেন তা তো একদিনও বললেন না।'

'সেটা এমন কিছু বলবার মতো নয়, একটা কলেজে পড়াই।'

'কোন কলেজে?'

'নাম যদি না বলি।'

'বলুন না।'

'ন'।

'তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি সেটা আপনার মনগড়া কলেজ।'

'ঠিক ধরেছেন।'

'আচ্ছা, আপনার সেই কলেজে কি শুধুই ছাত্রই আছে, না ছাত্রীরাও পড়ে?'

'শুধু ছাত্র।'

'বাঁচালেন। ছাত্রীরা পড়লে আমার ভারি হিংসে হত।'

'কেন হিংসে কিসের?'

'আর বলব না।' " ('ফোন')

৩. "হঠাৎ শিপ্রা বলল, 'আচ্ছা সুজিতবাবু, একটা বাজি রাখতে রাজী আছেন?'

সুজিত একটু ক্ষুন্ন হয়ে বলল, 'ফের বাবু?'

শিপ্রা বলল, 'ওটা বিলুপ্ত হবে, যদি বাজিতে জিততে পারেন।'

'বেশ বাজিটা কী।'

শিপ্রা বলল, 'আপনি আপনার স্ত্রীকে ফের সেইরকম কচ সাজাতে পারেন?'

সুজিত বলল, 'নিশ্চয়ই। কখন?'

শিপ্রা বলল, 'এখন, এই মুহূর্তে।' " ('দেবযানী')

৪. 'একটু বাদেই টুকু মুখ তুলে সোজা মিলির দিকে তাকাল। তারপর সস্নেহ শাসনের ভঙ্গিতে বলল, 'তুই তো ভারি ফাজিল হয়েছিস মিলি। বিয়ের আগেই এই, বিয়ে হলে না যেন কী করবি।'

মিলি মৃদুস্বরে বলল, 'কী আর করব। বছর বছর মা হব।'

টুকু হেসে বলল, 'যেন অতই সোজা।'

মিলি বলল, 'পরীক্ষায় সেভেনটি টু পার্সেন্ট পাওয়ার চেয়ে সামান্য একটু কঠিন, তাই না?'

টুকু বলল, 'কী অহংকার। না হয় একটু ভালো পাশই করেছিস। তাই বলে নিজের ঢাক নিজে পেটাবি নাকি অমন করে?'

মিলি বলল, 'কী করি বল। আমার তো আর তোর মত অমন একজন কেউ আসেনি যে ঢাক পিটিয়ে দেবে।'

টুকু বলল, 'আহা-হা, কী আফশোস। তাহলে মামীমাকে বলি তোকে হস্টেল টস্টেলে পাঠানো বন্ধ রেখে সম্বন্ধ দেখুক।'

মিলি বলল, 'ঈস্। তার জন্যে মামীকে বলা কী দরকার? তোর জন্যে কাকে বলতে হয়েছিল শুনি? নিজেদের ব্যবস্থা তো নিজেরাই করে নিয়েছিস।'

টুকু লজ্জিত হয়ে বলল, 'তুই তাও শুনেছিস? কার কাছ থেকে শুনেছিস বল তো?'

মিলি বলল, 'সোর্স আমি বলব না। আমি বলি আর তুই তার গর্দান নে। 'It is an open secret' বিশ্ববাসী জানে।' " ('মাধবী মঞ্জরী')

নরেন্দ্রনাথ নিজে বাকপটু ছিলেন না[১]। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পের সংলাপ রচনায় তিনি অনবদ্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরবিন্যাস ও বহুস্তরীয় মানুষের ভাষা পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বদল হয়ে যায় আবার একই মানসিকতায় বা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন স্তর ও বিত্তের মানুষের ভাষাও এক থাকে না। নরেন্দ্রনাথের গল্পের সুবিশাল ভাণ্ডারে উচ্চবিত্ত অপেক্ষা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের ভীড় সহজেই চোখে পড়ে কিন্তু এই একই শ্রেণিভুক্ত মানুষের মধ্যেও যে সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাস বর্তমান তা, তাদের ভাষা ব্যবহারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণি এবং একই অর্থনৈতিক শ্রেণিভুক্ত মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের মানুষের এমনকি স্ত্রী ও পুরুষের সংলাপেও ভাষার সুস্পষ্ট পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থেকে চরিত্র অনুযায়ী তাদের সংলাপের পার্থক্য করেছেন। কেবলমাত্র সংলাপ নয়, পরিস্থিতির বিচারে বিভিন্ন স্তরের মানুষের কার্যকলাপও যে ভিন্ন হয় সেই দিকটিও নরেন্দ্রনাথের গল্পে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সংলাপের ক্ষেত্রে ভাষারীতির সুস্পষ্ট পার্থক্যকে আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সুস্পষ্ট করা যেতে পারে—

১. "এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুটি ক'রে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এ জৈন্যই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে।'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিওনা।' "('রস')

২. " বিনোদ আঁচাতে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'আসলে সেই হচ্ছে

কথা। আমি যে একটু ক'রে দুধ খাই, তা তোমার প্রাণে সয়না, তা তুমি দু'চোখে দেখতে পারনা। সেই হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মর।'

লতিকা বলল, 'তোমার দুধ খাওয়া দেখে আমি জ্বলে পুড়ে মরি! মরি তো বেশ করি। বুড়ো বেটা তুমি, লজ্জা করেনা রোজ রোজ সকলের সামনে দুধ খেতে! একদিন দুধ কম পড়লে তাই নিয়ে বাড়ি মাথায় করতে!'

এঁটো হাতেই বিনোদ রুখে এল, 'লজ্জা করবে কেনরে হারামজাদী আমি কি তোর বাপের পয়সায় দুধ খাই, নিজের পয়সাই খাই - নিজে খাই আমি। লজ্জা তোদের করা উচিত।' "('এক পো দুধ')

৩. " ম্যানেজার বিদায় নিলে রেবা ছুটে এল ঘরে, 'এই শোন মূর্তিটা কাউকে বিক্রি করতে পারবে না কিন্তু, ওটি আমি নেব, ভারি চমৎকার হয়েছে।'

অবিনাশ শ্লেষের হাসি হাসল, 'ম্যানেজারের মুখ থেকে কথাটা মুখস্থ ক'রে নিয়েছ বুঝি।'

'বাঃ! তা কেন? সত্যি আমার ভারি ভালো লেগেছে।'

অবিনাশ বলল, 'তাই নাকি? আমার অসীম সৌভাগ্য। কিন্তু দুদিনের মধ্যে হাজার টাকায় মূর্তিটা বিক্রি হয়ে যাবে দেখে নিও।' "('প্রতিদ্বন্দ্বী')

উপরোক্ত তিনটি উদাহরণের প্রথমটিতে 'রস' গল্পে সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি মুসলিম দম্পতি মোতালেফ ও ফুলবানুর কলহের সংলাপ উপস্থাপিত হয়েছে। অপর দুটি উদাহরণে যথাক্রমে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী-স্ত্রী বিনোদ ও লতিকা ('এক পো দুধ' গল্প) ও সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি অবিনাশ ও রেবার দাম্পত্য জীবনের কলহের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মোতালেফ কলহের সময় কেবলমাত্র 'হারামজাদী', 'বিদ্যাধরী' প্রভৃতি অশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হয়নি উপরন্তু ফুলবানুকে চুলির মুঠি ধরে প্রহারও করেছে। 'পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে মোতালেফের সামাজিক স্থানটি পরিস্ফুট হয়। অপরদিকে বিনোদ ও লতিকার মধ্যে বাদানুবাদে কেবল অশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ হয়েছে যেমন - 'বুড়ো বেটা', 'হারামজাদী' ইত্যাদি। এখানে বিনোদ লতিকার গায়ে হাত তুলবার সাহস পায়নি। এছাড়া 'তোমার প্রাণে সয়না' বা 'সেই হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মর' বাক্যগুলি ব্যবহারে মোতালেফ ও ফুলবানুর কলহের ভাষার সঙ্গে বিনোদ ও লতিকার কলহের ভাষা পৃথক হয়ে যায়। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পে দেখা যায় অবিনাশ ও রেবা যেহেতু সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি সেইহেতু সেখানে প্রহার দূরস্থান অশিষ্ট শব্দের প্রয়োগও তাদের সামাজিক অবস্থানের পরিপন্থী। এই গল্পে অবিনাশ ও রেবার সম্পর্কের তিক্ততা তাই প্রকাশিত হয়েছে শ্লেষ তীক্ষ্ণতায়। 'আমার অসীম সৌভাগ্য' বা 'ম্যানেজারের মুখ থেকে কথাটা মুখস্থ ক'রে নিয়েছ বুঝি' —এই বাক্যবন্ধগুলি সেই শ্লেষাত্মক

কলহবাক্যের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে বক্তাদের বক্তব্য ও আচরণে তাদের সামাজিক অবস্থান, রুচি ও শিক্ষার পার্থক্য সূচিত হয়েছে আর তাদের বদলে যাওয়া সংলাপে ভাষা সেই পার্থক্যের পরিচয়বাহী হয়েছে।

এখানে নারী-পুরুষের কলহের ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি দিক লক্ষ্যণীয়, আর তা হল পুরুষের আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য তিন রমণীর আচরণগত পার্থক্য। প্রত্যেকের প্রতিরোধের ধরণটিও তাদের সামাজিক অবস্থানের মতই ভিন্ন। ফুলবানু মোতালেফের শারীরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণ করতে পারেনি। দৈহিক ভাবে তো নয়ই এমনকি মুখেও সে প্রতিআক্রমণ করতে সক্ষম হয়নি। কেবল আত্মরক্ষায় দায়ে বলেছে, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিওনা।' ফুলবানু সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির গৃহবধূ, সে জানে গৃহকর্মে ও স্বামীর জীবিকা অর্জনে তাকেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে, সেইখানে তার ত্রুটি ঘটেছে এও সে স্বীকার করে নিচ্ছে 'তাই বইলা' শব্দটির দ্বারা তার অপরাধের পরোক্ষ স্বীকৃতি যেন ফুলবানু দিয়েছে। সে জানে কাজে ত্রুটির জন্য কিছু শাস্তি প্রাপ্তিও তার স্বাভাবিক, সে কেবল শারীরিক নিগ্রহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। অপরদিকে 'এক পো দুধ' গল্পের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ লতিকা তার সামাজিক অবস্থানের কারণেই অনেক বেশি প্রতিবাদে সক্ষম। সে স্বামীর কটু বাক্যকে নীরবে সহ্য না ক'রে স্বামীর প্রতি তীব্র বাক্যবাণ হেনেছে। যেমন— 'বুড়ো বেটা তুমি, লজ্জা করেনা....' ইত্যাদি ইত্যাদি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের সংলাপ সমূহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় কলহের ভাষার মত চরিত্র অনুসারে প্রেম নিবেদনের ভাষারও পার্থক্য ঘটেছে। যেমন 'রস' গল্পে মোতালেফ মাজুখাতুনের সঙ্গে করেছে প্রেমের অভিনয়, কারণ ফুলবানুকে বিয়ে করবার জন্য প্রয়োজন অর্থ আর সেই অর্থ সংগ্রহের হাতিয়ার মাজুখাতুন। ফুলবানু ও মাজুখাতুন এই দুই রমণীকেই মোতালেফ প্রেম নিবেদন করেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রেম ও কপট প্রেমের জন্যই উভয়ের ক্ষেত্রে তার আচরণের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে তার মুখের ভাষা। দুই রমণী অর্থাৎ ফুলবানু ও মাজুখাতুনের সঙ্গে মোতালেফের কথোপকথন পর্যালোচনা করলেই ভাষা ব্যবহারের এই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। ফুলবানুর সঙ্গে মোতালেফের কথোপকথন নিম্নরূপ-

"এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরা একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায় না, কেবলমাত্র রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝছ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝেছে।

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা অকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি খেত বেচতে যাইও না।'

বেচবার মত জমি অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ,

বলল, 'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার ?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।"

অপরদিকে চতুর মোতালেফ মাজুখাতুনের কাছে তার কপট প্রেম নিবেদন করেছে এইভাবে—

"মোতালেফ মিষ্টি করে বলল, 'গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।' মাজুখাতুন বলল, 'তো যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, রাজী হবা তো নিতে?' "

উপরের দুটি উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় মোতালেফ মাজুখাতুনের সঙ্গে যেহেতু প্রেমের অভিনয় করেছে, সেইজন্য সেই ক্ষেত্রে তার আচরণে ও সংলাপে কৃত্রিমতা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত। সে মাজুখাতুনের কাছে কৃত্রিম কাব্যময়তায় প্রেম নিবেদন করেছে; ব্যঞ্জনা বাহুল্যে বক্তব্যকে ক'রে তুলতে চেয়েছে মধুর ও সংকেতময়। 'গতরের সুখ' ও 'মনের সুখে'র সম্পর্ক বা 'চাইর আনা'র পরিবর্তে 'ষোল আনা' দিতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে মূল বক্তব্যকে গূঢ় ব্যঞ্জনাময় মাহাত্ম্য দান করা তার উদ্দেশ্য। অপরদিকে ফুলবানুর সঙ্গে কথোপকথনে সে অনেক স্পষ্টতার পরিচয় দিয়েছে আর অন্তরের উদ্বেগ আশঙ্কাও সেখানে প্রকাশিত। তাই সে বলেছে - 'কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার ?' এছাড়াও দেখা যায় ফুলবানুকে মোতালেফ মাজুখাতুন অপেক্ষা অধিক অন্তরঙ্গ সম্বোধনে আপ্যায়িত করেছে; মাজুখাতুনকে সে বলেছে 'বিবি' আর ফুলবানুকে 'বিবিজান'। সংলাপের পার্থক্য ব্যতীতও উভয় ক্ষেত্রে মোতালেফের আচরণগত পার্থক্যও বিশেষ লক্ষ্যণীয়। মাজুখাতুনের সঙ্গে তার কথোপকথন বর্ণনায় লেখক বলেন— 'মোতালেফ মিষ্টি করে বলল' অর্থাৎ বচনের এই মিষ্টত্ব বক্তার অন্তরের নয়, তা আরোপিত। তাই বক্তা মিষ্টি সুরে না বলে 'মিষ্টি করে' বলে। এরপরেও মোতালেফ চেয়েছে পুনরায় মায়া বিস্তার করতে, তার এই মনোভাব তার দেহভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। লেখক বলেন - 'মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল' -এখানে 'এবার' শব্দের ব্যবহার পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, মোতালেফ পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক মাজুখাতুনকে সন্তুষ্ট করতে এসেছে। অপরপক্ষে 'মধুরভঙ্গি' শব্দে বোঝা যায় মোতালেফের হাসির মাধুর্য অকৃত্রিম নয় তা ভঙ্গি বা অভিনয় মাত্র, তা স্বেচ্ছায় আরোপিত। অন্যত্র মোতালেফের এই বিনয় বা কাতর প্রেম নিবেদনের রূপটি বদলে গেছে। ফুলবানুর সঙ্গে কথোপকথনে তার বলিষ্ঠতা ও তেজ প্রকাশ পেয়েছে। সে কখনো ফুলবানুর কথার উত্তরে নিশ্চুপ থেকে ঘাড় নেড়ে বক্তব্যকে প্রকাশ করেছে, আবার কখনো তেজস্বীতা

প্রকাশ করে বলেছে - 'ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব।' আবার একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা।

সংলাপে আঞ্চলিকভাষার প্রয়োগ ঃ

নরেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর কাল কেটেছে পূর্ববাংলায়, ফরিদপুর জেলায় অন্তর্গত সদরদি গ্রামে। ফলে পূর্ববঙ্গের ভাষার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এছাড়া পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগণের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাদের তিনি তাঁর ছোটগল্পে বহুলাংশে স্থান দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ব্যতীত নরেন্দ্রনাথ মিত্রই মুসলিম জনগণকে নিয়ে সর্বাধিক ছোটগল্প রচনা করেছেন। এই কারণে পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত চলিত ভাষার সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গিটিও নরেন্দ্রনাথ সার্থকভাবে তার রচিত ছোটগল্পের সংলাপ রচনায় ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে বাস্তবগ্রাহ্য ও জীবন্ত। তারা তাদের ধূলি মাটির গন্ধ সহ আমাদের সামনে চলে ফিরে বেড়ায়। চণ্ডী লাহিড়ী লিখেছেন - 'পূর্ববঙ্গের মানচিত্র নরেনবাবুর মুখস্থ। সেখানকার জনজীবনের নিত্যদিনের ভাষাও তাঁর জানা।'[২] এই অভিজ্ঞতারই ছায়াপাত ঘটেছে পূর্ববঙ্গের মানুষদের নিয়ে রচিত ছোটগল্পগুলির সংলাপ রচনায়। এখন কিছু উদাহরণ উদ্ধার করে নরেন্দ্রনাথের গল্পে সংলাপ রচনায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগের দিকটি পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

১. " একটু ইতস্ততঃ করে একটু ভেবে চম্পা বলল, 'কিন্তু যদি ধইরা ফেলায়' । লালমোহন একটু হাসল, 'তাইলে তো বোঝই। হাত ধরাধরি কইরা দুইজনরেই জেলে যাইতে হইবে। শুনছি জায়গাডা নেহাৎ মন্দ না সেখানে। খোরাকও মেলে, থাকার জায়গাও মেলে।'

চম্পা বলল, 'বেশ রাজী আছি। কিন্তু পেরথমেই ধইরা ফেলবে যে। আপনার কেমন ধোপ-দুরস্ত ফর্সা জামা কাপড় আর আমার এই নোংরা ছেঁড়া শাড়ি। স্বামী-স্ত্রীর মত মানাবে কেন?'

লালমোহন খুশি হয়ে বলল, 'ঠিকই তো কইছ। তোমার বুদ্ধি আছে চম্পা। এমন বুদ্ধি আগাগোড়া থাকলে তুমি কেবল আমার ক্যান, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের বউ হইতে পারবা। দাঁড়াও একটু। আমি সব ব্যবস্থা কইরা আনি।' " ('শুল্ক')

২." তরঙ্গ উল্লসিত হয়ে উঠল, 'দেখলাম তাজ্জব জিনিস বউদিদি। ছবিতে কথা কয়, গান গায়। আহাহা সেকি গান! তারপর দিদিমণির মত বয়সী একজন সুন্দরী আব্বিয়াত মাইয়ার সঙ্গে -' তরঙ্গ মুখ টিপে একটু হাসল। 'আর পুরুষ মানুষটা ঠিক আমাগো ও বাসার ছোট দাদাবাবুর মত। তারপর দুইজনে

মিলা হাত ধরাধরি কইরা -' "('দ্বিচারিণী')

৩." ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব?'

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায়না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝ্ছ ?' .....

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

মোতালেফ বলল, 'আইচ্ছা শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।' " ('রস')

৪." রাজমোহনকে পিছিয়ে যেতে দেখে মকবুল একটু হাসল, 'ডরাইলেন নাকি ধলাকর্তা। ডরাইবেন না। শত হইলেও আপনি বুড়া। এ মুল্লুকের মানী-জ্ঞানী মানুষ। আপনারে কি আমি অপমান করতে পারি? কিন্তু ও টাকা আপনে ফিরাইয়া নিয়া যায়ন। আমার ছাওয়াল-মাইয়া মিষ্টি খায় না। খাইলে তাগো প্যাটে কিরমি হয়, প্যাট কামড়ায়, আপনে বাড়ি যায়ন ধলাকর্তা। খাট আমি ফেরত দেব না।'

অপমানে রাজমোহনের মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো। রোমশ কান দুটো পুড়ে যেতে লাগল। টাকাগুলি ট্যাঁকে ফের গুঁজে রাখতে রাখতে রাজমোহন বললেন, 'আইচ্ছা, কিন্তু কথাটা মনে রাইখো মকবুল শেখ, মনে রাইখো। পাকিস্তান পাইচ বইলা যে, সকলেই লাট হইয়া গেছে, তা ভাইবো না, ভাইবো না এক মাঘেই শীত যাবে।' " ('পালঙ্ক')

৫." রাজমোহন চলে গেলে ফতেমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে বলল, 'হইছে কি? ধলাকর্তা অমন রাগারাগি করলেন ক্যান?'

মকবুল বলল, 'আর ক্যান! খাট বিক্রি কইরা আবার সেই খাট ফিরাইয়া নিতি আইছেন। টাকা সাধাসাধি করতি আইছেন।'

ফতেমা বলল, 'কাণ্ড দ্যাখ। তা কি কইলা তুমি?'

মকবুল হেসে বলল, 'পায়ে ধইরা কইলাম, ধলাকর্তা, যদি পছন্দ হয়, পালং-এর বদলে আমার বিবিরে নিয়ে যায়ন।'

ফতেমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আউ আউ আউ। বুড়া মানুষডারে তুমি অমন কথা কইতে পারলা?

শরম করল না?' ....

ফতেমা এবার বলল, 'কিন্তু মাইয়া-মানুষই যদি সব মেঞা, মাইয়ামানুষ থাকলে যদি তোমাগো আর কিছুই না লাগে, তাইলে পালং পালং কইরা তুমিই বা অস্থির হইছ ক্যান। দিয়া দাওনা ধলাকর্তার পালং ধলাকর্তারে। উনি মানুষ তো সোজা না। ভালো না করতে পারেন, মন্দ করলে ঠ্যাকায় কেডা? ছাওয়ালপান লইয়া ঘর করি, যাই কও, আমার কিন্তু বুকের মদ্যি কাপে।'

মকবুল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাপুক বিবি, কাপুক! তোমাগো বুক কাপবার জন্যেই হইছে, কাপলেই সোন্দর ঠেকে।' " ('পালঙ্ক')

মানসিক অবস্থার চিত্রণ ঃ

আলোচক বলেন— " আধুনিক ছোটগল্পে মানুষের জটিল চিত্তবৃত্তি অন্যতম মুখ্য বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। বাইরের ঘটনার গুরুত্ব কমে গিয়ে ক্রমশঃই বড়ো হয়ে উঠেছে হৃদয়াবেগের ছবি।"[৩] প্রকৃতপক্ষেই বর্তমানকালে মানুষের অন্তর্জীবনের চিত্রায়নেই গল্পকারদের বিশেষ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রভাবিত গল্পকারদের মত বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে মানুষের মনোলোকের উন্মোচনে হয়তো নরেন্দ্রনাথ উচ্চকিত হয়ে উঠেননি বা কেবল মনোবিকারকে চিত্রিত করতেই তাঁর সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করেননি কিন্তু তাঁর গল্পের চরিত্রদের মনোজগতকে তিনি শক্তিশালী লেখকের মতই অনুসন্ধান করেছেন এবং সেই মনোজগতের অগাধ রহস্য অনুসন্ধানে সফল হয়েছেন। 'যৌথ' গল্পে স্বরূপের মানসিক অবস্থার চিত্রণে নরেন্দ্রনাথ লেখেন— "কিন্তু দিনের পর দিন সময় বদলায়, আর বদলায় মানুষের মন। সময় কি সত্যিই বদলায়— না মানুষের পরিবর্তনে সময় বদলানো মনে হয়? ..... না, সময় ঠিক এক রকমই থাকে বোধ হয়। বদলায় কেবল মানুষ— মনে আর ব্যবহারে।" প্রকৃতপক্ষে এখানে লেখকের স্বরন্যাসই ধরা পড়ে। যেহেতু তিনি ছিলেন 'মনের কারবারি'। সেইহেতু মানুষের মানসিকতার চিত্রণ তাঁর গল্পে বিশেষ প্রাধান্য ও উজ্জ্বলতা নিয়ে ধরা পড়েছে। এই মন মানসিকতা প্রকাশের ভাষা, মানুষের আদিম চিত্তবৃত্তির পঙ্কিল বর্ণনায় আবিল নয়, বরং অনেক সংযত, অনেক ইঙ্গিতময় কিন্তু গভীরতায় তা অতলস্পর্শী। তাঁর লেখা গল্প থেকে কিছু উদাহরণ উদ্ধার করা যেতে পারে -

১."আকাশের দিকে তাকালেন মৃগাঙ্কবাবু। অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে। ..... দুটি একটি তারা ছাড়া সব তারাই মৃগাঙ্কবাবুর কাছে বেনামা, অজ্ঞাতকুলশীল। তবু আশ্চর্য, মাঝে মাঝে ওই অজ্ঞাত

রহস্যলোক তাঁকে হাতছানি দেয়। এই সীমাহীন অফুরন্ত আকাশ তাঁকে একটি মাত্র প্রশ্ন করে, কেন? কেন? কেন? এই গণ্ডীবদ্ধতা কেন? কেন এই দেহজাত সংস্কার আর মনোগত বাসনার বন্ধন? কেন এই ঐকান্তিক আত্মরতি আর অন্তহীন অনাত্মীয়তা।"('গণ্ডী')

২." 'অসিত বলল, 'ঠিক বলেছিস। আলস্য, ঔদাস্য আর জড়তা সব ঢেকে দিচ্ছে। সেই প্যাশন আর কোন কিচ্ছুর মধ্যে নেই। না প্রেমে না বন্ধুত্বে না হিংস্র শত্রুতায়। তোর কি মনে হয় না মাত্র এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বয়সে এসেই আমরা বুড়িয়ে যাচ্ছি? বড্ড তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছি?' "('অভিন্ন হৃদয়')

৩."মৃত্যুশোকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন অনিমেষ। তাঁর মনে হল জরার জন্যেও সান্ত্বনা দরকার। জরা মৃত্যুরও বাড়া।" ('বীতশোক')

৪."দীর্ঘকালের নাগরিক অভ্যাস বদলানো শক্ত। মনের জোর জিহ্বায় যত সহজে সঞ্চারিত হয় অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তত সহজে হয়ে ওঠে না।" ('নাম')

৫."লাভ যে কী চিন্ময় তা ওদের বোঝাতে পারবেনা। গুণের উপভোগের স্বাদ একরকমের আর মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাদ অন্যরকমের। দোষে গুণে, মূঢ়তায় বুদ্ধিমত্তায় মহত্ত্বে ক্ষুদ্রতায় মিশ্রিত যে মানুষ তাঁর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের সৃষ্টি সাহিত্য সংগীত কি চিত্রকলার তুলনা হয় না। সৃষ্টি যদি হয় ফুল স্রষ্টা সেখানে অরণ্য অন্তত বনস্পতি। এই ব্যক্তিগত সান্নিধ্য বন্ধুত্ব এবং হৃদয়ের উত্তাপ গ্রহণের জন্য চিন্ময়ের আগ্রহের সীমা নেই। কিন্তু তার আগ্রহ অসীম হলে কী হবে তারা যেন সব নির্বাপিত তাপ গ্রহ-উপগ্রহ। শীতল, একান্ত শীতল তাদের হৃদয়ের পরিমণ্ডল। নাকি চিন্ময় নিজেই অন্য কোনও অজানা গ্রহের অধিবাসী। এই পৃথিবীতে সে একান্ত প্রবাসী বহিরাগত। বহিরাগত কিন্তু যেখান থেকে এসেছে সেই স্বস্থানে ফিরে যাওয়ার পথও আর নেই। সেই পথের চিহ্ন সে যেন নিজেই মুছে দিতে দিতে এসেছে। এখন একমাত্র প্রস্থান ক্ষেত্র আছে অন্তরলোক। আর সবাইকে বাদ দিয়ে আর কারো কাছে কোনও কিছু প্রত্যাশা না করে শুধু নিজেকে নিয়ে বাস করা। মন চল নিজ নিকেতনে। সেই নিকেতনে কোনও সঙ্গী নেই, সঙ্গ কামনাও অবলুপ্ত হয়ে গেছে। যাদের ভিতরে কিছু নেই সেই রিক্ত অকিঞ্চন অভাজনেরাই নিজেকে ভয় পায়। তাদের স্ব-ত্ব বলে কিছু নেই। শুধু নিঃস্বতা আছে। তারা নিজেকে দু'মিনিটের বেশি সহ্য করতে পারে না। কিন্তু যাদের মন অর্জিত বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা চিন্তা আর কল্পনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ তারা বসে বসে নিজের ব্যক্তিত্বকে উপভোগ করে। আর কারো কাছে যাওয়ায় তাদের দরকার হয় না।" ('দূতী')

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি যেমন চরিত্রদের মানসিক অবস্থার দিকটিকে প্রকাশিত করেছে তেমনি আর একটি দিকও এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হল লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি। এই ভাবনাগুলি যেমন চরিত্রদের নিজস্ব, তেমনি এর মধ্য দিয়ে লেখকের স্বরন্যাসও ধরা পড়ে, অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের ব্যক্তিগত

অনুভূতি, দার্শনিকতা চরিত্রদের অন্তর্লীন ভাবনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনের কঠোর বাস্তবতার বর্ণনা ঃ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিজে ছিলেন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। যদিও দেশবিভাগের পূর্বেই তিনি কলকাতায় চলে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর পরিবারের অন্যান্যরা দেশবিভাগের পরেই কলকাতাবাসী হন। সপরিবারে কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে মধ্যবিত্ত মানুষের বিশেষত উদ্বাস্তু মানুষদের যে জীবনযাত্রা তিনি নিজে যাপন করেছেন সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি বহু ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন এমন মানুষদের জীবন কাহিনি বর্ণনায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাসস্থানের অপ্রতুলতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের চিত্রও তাঁর বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্প থেকে কিছু উদ্ধৃতি উদ্ধার করা যেতে পারে—

১. "একতলার ভাড়াটে ক্ষিতীশ আর প্রিয়তোষ। দু'জনেরই একখানা করে শোয়ার ঘর, একখানা রান্নার। এজমালী কল, চৌবাচ্চা, পায়খানা, ছাদ। একই দড়িতে দুই পরিবারের ধুতি, পাঞ্জাবি, শাড়ি, শেমিজ, জামা প্যান্ট শুকোয়। একই সরু প্যাসেজটুকু দিয়ে লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে চটি পায়ে দিয়ে দু'জনে বাজারে বেরোয়। বাঁ হাতে থলি, ডান হাতে দুটি আঙ্গুল ঠোঁটের জ্বলন্ত বিড়িতে আটকা থাকে। রেশন আনবার দিন একই দোকানের সামনে একই সারিতে দু'তিনটে থলি হাতে সপ্তাহে ঘণ্টা দেড়েক করে দু'জনে দাঁড়ায়। সাড়ে ন'টার মধ্যে নাকে মুখে ভাত তরকারি গুঁজে দু'জনেই ছুটতে ছুটতে বাসের হ্যান্ডেল ধরে। কোনদিন ভিতরে ঢোকে, কোনদিন সারাটা পথই ঝুলতে ঝুলতে অফিসে গিয়ে পৌঁছায়। প্রিয়তোষ সরকার আর ক্ষিতীশ মজুমদার। জাতে একজন কায়স্থ আর একজন ব্রাহ্মণ। কিন্তু আভিজাত্যে দু'জনেই সমান।" ('ঋণ')

২. " রাজধানীই বটে, অনেক খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এই শহরতলীতে এসে ঘর মিলেছে একখানা, একতলার স্যাৎসেঁতে ঘর চুন-বালি-ঝরা কত কালের পুরনো দেয়াল। জোরে বৃষ্টি নামলে ছাদ চুঁয়ে জল পড়ে জায়গায় জায়গায়। ঘটি বাটি পেতে রাখতে হয় ধরবার জন্য। জানলা দু'টি আছে বটে, কিন্তু খুলবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা নর্দমার গন্ধও আছে। বাথরুমটা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। কল-চৌবাচ্চা নিয়ে তিন ঘর ভাড়াটে, আর উপরের বাড়িওয়ালার সঙ্গে মারামারি কাড়াকাড়ি। নোংরা ভরা উঠোন। মশা আর দুর্গন্ধ ভরা ঘর। গন্ধে, গানে এই তো কলকাতা।" ('কাঠগোলাপ')

নিম্নবিত্ত মানুষদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার চিত্রকেও নরেন্দ্রনাথ সমান দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। যেমন—

ক. "পটলডাঙ্গা স্ট্রীটে বাণী পাবলিশিং-এ প্রুফ-রীডারের কাজ করে বিনোদ। সব সময় কাজ থাকে না। মাঝে মাঝে দশ-পনের টাকার টিউশনি পায়। ইনসিওরেন্সের একটা এজেন্সী আছে। পরিচিত বন্ধুদের পিছনে হাঁটাহাঁটি করে স্যাণ্ডাল ক্ষয় ক'রে ফেলে। তবু বছরে তিন-চার হাজারের বেশি দিতে পারে না।" ('এক পো দুধ') এ বর্ণনার ভাষা সহজ সরল কিন্তু অতিশয় জীবন্ত। এর অন্যতম কারণ এই জীবন নরেন্দ্রনাথ নিজে অতিবাহিত করেছেন। 'এক পো দুধ' গল্পটি প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৫৯ সালে আর ২৫ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ তারিখে কলকাতা থেকে নরেন্দ্রনাথ স্ত্রী শোভনাদেবীকে একটি পত্রে লেখেন— "চাকরি আর রাখা গেলনা। ওদের সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে গেছে। এখন যে-কোনওদিন নোটিশ দিয়ে দিলেই হয়। অন্য খোঁজখবর করছি। চাকরি একটা জুটবে, যখনই হোক। তবে মাঝখানে আবার হয়তো কিছুদিন চলবে সেই বেকার জীবন।" অতএব, যে লেখক নিজে উদ্বাস্তু ছিন্নমূল, নিজে কলকাতা শহরে জীবিকা অর্জনের জন্য জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছেন তাঁর লেখায় যে নিম্নবিত্ত মানুষের কঠোর জীবন সংগ্রাম অভিজ্ঞতার রসে জারিত হয়ে জীবন্ত রূপ লাভ করবে,তাতে আর আশ্চর্য কি । মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন ও জীবিকা লাভের সংগ্রামের চিত্র তাই নরেন্দ্রনাথের গল্পে যত্রতত্র অথচ মহামূল্য মণি মাণিক্যের মতই উজ্জ্বল রূপে বিরাজ করছে । আরো কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে—

১. "শীতাংশু বলল, অল্প মাইনে আর অতিকষ্টের চাকরি। তাওতো ডিপার্টমেন্ট এখনও স্থায়ী হল না। চাকরি কবে আছে কবে নেই তারই বা ঠিক কি। পাটের সময় তো প্রায় সর্বদা মাঠেমাঠেই বেড়াতে হয়। ফিরে গিয়ে দুদিন যে একটু শান্তিতে নিশ্বাস নেবে তারও জো নেই। অড়িয়াল খাঁ নদীর পারের চর। তারই গা ঘেঁষে অফিস। টুল টেবিল সরিয়ে রাত্রে তার মধ্যেই শোয়ার জায়গা করে নিতে হয়। শুয়ে শুয়ে কানে আসে নদীর অন্য পার ঝুপ ঝুপ করে অনুক্ষণ ভেঙে পড়ছে তো পড়ছেই। এদিকে জাগছে চরের পর চর। আর কিচ কিচ করছে বালি। হাওয়া একটু জোরে বইলেই সে বালি উড়ে আসে চোখে মুখে, বিছানাপত্রের মধ্যে। ঝাড়াপোছার পর বিছানা বালিস থেকে যদি বা সে বালি যায়, মনের ভিতর থেকে কিছুতেই তা দূর হতে চায় না। সেখানে দিনভর রাতভর বালি কেবল কিচ কিচ করতেই থাকে।" ('ঘুষ')

২. "..... মার্চেন্ট অফিসের কেরাণীগিরি করে শিশিরের ভাতাটাতা ধরে এখনো পুরোপুরি দু'শো তে পৌঁছয়নি। টাকা পনের কমই আছে। অথচ দেশের বাড়ির সবাইকে কলকাতায় নিয়ে আসতে হয়েছে। খরচের সঙ্গে আর পেরে ওঠা যায় না। প্রত্যেক মাসেই ভাবে, লাইনটা ঠিক করে নেবে। কিন্তু হয়ে ওঠে না। মাইনে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অর্ধেক টাকা আগের মাসের মুদি, কয়লা, ধোপার হিসাব শোধ করতে জলের মত বেরিয়ে যায়।" ('দীপান্বিতা')

ভাষায় কবিতার ব্যবহার ঃ

নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভাষা আলোচনার প্রথমেই তাঁর গল্পের ভাষায় কাব্যিক রীতির ব্যবহারের

দিকটি দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে। যেহেতু কবিতার প্রতি তার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ও আকর্ষণ ছিল তাই তাঁর রচনায় বহু কবিতা সরাসরি উঠে এসেছে। এই সকল কবিতা কখনো সরাসরি, কখনও বা গদ্যাকারেও উঠে এসেছে— 'কিন্তু সব নামই তো রাধার শ্যাম নাম নয়, যে কানের ভিতরদিয়ে মরমে পৌঁছুবে।' (একটি মৃত্যু ও আমি)। তাঁর রচনায় ব্যবহৃত কবিতাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র বাংলা কবিতাই নয়, ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজি কবিতা, বৈষ্ণব পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের রচনা, কখনও বা সংস্কৃত শ্লোক। তাঁর গল্প থেকে অংশ উদ্ধার করে এই কবিতার ব্যবহার দেখানো যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের রচনার ব্যবহার—

ক. 'সে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সত্যি বলা যায়, 'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান,' ('হলদেবাড়ী')

খ. 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির' ('ছোট দিদিমণি')

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতার ব্যবহার—

ক. "ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কী দেখাও ভয়
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" ('উদ্যোগ পর্ব')

বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যবহার—

ক. 'যখন নাইট ডিউটি পড়ে তখন আমরা 'রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি' ('একটি মৃত্যু ও আমি')

সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার—

ক. 'রাজা হেসে বলেন, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।' ('শিখরে মুখ')

খ. "অর্থপ্রাপক কর্যৈক প্রযত্নপরতা বুধেঃ
প্রোজা পৌরুষ শব্দেন সর্বসমাদৃতেহনয়া।।" ('উদ্যোগ পর্ব')

গ. "অকৃত্বা মানুষং কর্ম যো দৈবমনুবর্ততে
বৃথা শ্রম্যতি সম্প্রাপঃ পাতং ক্লীবমিবাঙ্গনা।।" ('উদ্যোগ পর্ব')

ঘ. "দৈবং পুরুষকারেণ বিনাপি ফলতি ক্বচিৎ
যদুক্তং তদ্বচো ব্যর্থং যতঃ সিদ্ধি প্রযত্নতঃ।।" ('উদ্যোগ পর্ব')

যথাক্রমে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মহাভারতের অনুশাসনপর্ব এবং স্কন্দপুরাণ থেকে উদ্ধৃত এই তিনটি সংস্কৃত শ্লোক ব্যতীত 'উদ্যোগপর্ব' গল্পটিতে বেশ কিছু ইংরেজি কবিতার অংশও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— ১. "How elsewise flit we

Through the mind's dominion
From book to book, from
leaf to leaf at will."

২. "I strove with none
For none was worth my
Strife,
I loved Nature and next to
Nature, Art
I warmed both hands before
the fire' of life
It sinks; and I am ready,
to depart."

এইসব সংস্কৃত শ্লোক ও ইংরেজি কবিতা ছাড়াও 'উদ্যোগ পর্ব' গল্পে আরও বেশ কিছু কবিতার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

ক. "যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিলে কেন
আকাশ পানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী।"

খ. "দিই নাই, চাই নাই, রাখিনি কিছুই
ভালোমন্দের কোন জঞ্জাল।"

গ. "মরুভূমি স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা
আপনি সুজলাবতী বারিদপ্রসাদে।"

'উদ্যোগ পর্ব' গল্পের মতই 'দেবযানী' গল্পে পদ্যের বহু ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই গল্পের চরিত্র শিপ্রা রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতির কালে দেবযানীর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছে এবং অন্তরে দেবযানীতে পরিণত হয়েছে। লেখক শিপ্রার মানসিক অবস্থা ও বাহ্যিক আচরণের ব্যাখ্যায় 'বিদায় অভিশাপ'-এর পংক্তিকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন—

"কিন্তু শেষ রাত থেকে সে আর 'শিপ্রা' নয় সে শুধু 'দেবযানী'। কাজ করছে, কথা বলছে - আর সেইসঙ্গে মনে মনে আবৃত্তিও চলেছে—

'কতদিন এই বনে
দিক্-দিগন্তরে আষাঢ়ের নীল জটা
শ্যাম স্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্মহীন দিনে সঘনকল্পনাভারে
পীড়িত হৃদয়;'

সেই আষাঢ়ের জলধারা সারাদিন ধরে মনের মধ্যে ঝ'রে পড়তে লাগল শিপ্রার। একই সঙ্গে মনোভূমিতে বর্ষা আর বসন্তের আবির্ভাব হল।"

এই গল্পে শিপ্রার মানসিকতা কাব্যপাঠের সঙ্গেই পরিবর্তিত হয়েছে এবং 'বিদায় অভিশাপ' থেকে পংক্তি সমূহের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার সেই মানসিকতাকে ব্যক্ত করতেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই কবিতার চরিত্রের সঙ্গে গল্পের চরিত্রের একাত্মতাই গল্পের মূল।

এ সকল গল্প ছাড়াও বেশ কিছু গল্পে নরেন্দ্রনাথ কবিতার পংক্তি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

১. "রুই কাতলা বোয়াল শোল কই মাগুর সিঙ্গি
চুঁচড়া চাঁদা রায়াক পুঁটি টাটকিনি মলুঙ্গী।" ('যাত্রাপথ')

২. "নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা
শৈল চূড়ায় নীল বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গরা
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে।" ('শ্বেত ময়ূর')

৩. "যা কিছু দিয়েছিলে ফিরিয়ে নাও তুমি
শুধু সে স্মৃতিটুকু নিও না নিও না।" ('একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান')

৪. "Take back the hope you gave - I claim
only a memory of the same." ('একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান')

৫. "যেমনি তুলেছে মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি,

অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া -

নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া

আলোক তাহার। সেকি আমি দেখি নাই?

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই

মোর কাছে।" ('দেবযানী')

'উদ্যোগ পর্ব' গল্পে যেমন বহু কবিতার পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি আরেকটি কাব্য বহুল গল্প 'পত্রবিলাস'। এই গল্প থেকে উদ্ধৃতি উদ্ধার করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

১. "যদিও জানি না

এ নামের মানে আছে কিনা।"

২. "নামের মান জানে পঞ্চজনে

নামের মানে জানি আপন মনে।"

৩. "মন যে বলে চিনি চিনি

যে গন্ধ বয় এই সমীরে।"

৪. "যা কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার জীবনহারা,

তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।

নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে, ভুখের পরে।

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে।"

সর্বজনীন বাক্য (General Statement) -এর ব্যবহার ঃ

'সংস্কারক' গল্পে নরেন্দ্রনাথ লেখেন— "সন্ধ্যার আলোয় মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা যেন এক রহস্যের ছোঁয়া পায়। মনে মনে ভাবি এই জীবন রহস্যের কতটুকুই বা এ জন্মে জেনে আর জানিয়ে যেতে পারব।" গল্পে কথকের এই ভাবনা প্রকৃতপক্ষে লেখকের জীবন ভাবনাকেই প্রকাশ করেছে। লেখক এমনভাবেই গল্পের চরিত্রদের সংলাপে, ভাবনায় এমন কিছু সর্বজনীন বাক্য রচনা করেছেন যেখানে লেখকের স্বরন্যাস বা toneটি ধরা পড়ে। এই স্বরন্যাস ধরা পড়েছে কখনও লেখকের বর্ণনায়, কখনো চরিত্রদের প্রত্যক্ষ সংলাপে, কখনও বা চরিত্রদের ভাবনার স্তরে। যেমন—

১. "মানুষ কোন একটি দোষের সঙ্গে অভিন্ন নয়, গুণের সঙ্গেও অভিন্ন নয়, একই মানুষ দোষে-গুণে ভিন্ন ভিন্ন। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্বে এমনকি ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে তার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। তবু আমরা দোষকে ক্ষমা করিনে, গুণকে গ্রহণ করি। অথচ সমগ্রভাবে গৃহীত হতে চাই।" ('মৃত্যু')

২. 'মেঘ ভাঙা রোদ জ্ঞাতি-দুর্বাক্যের মত দুঃসহ।' ('মৃত্যু')

৩. "বিদ্যা, বিত্ত, প্রণয়, প্রতিষ্ঠা কোন কিছুই শুধু আছে জানলেই থাকে না। সযত্নে সচেতন অনুশীলনে তাদের রক্ষা করতে হয়, বাড়াতে হয়।" ('মৃত্যু')

৪. 'বোবার যেমন শত্রু নেই, ঘুমন্ত মানুষেরও তেমনি সামাজিক কর্তব্য নেই।' ('একটি মৃত্যু ও আমি')

৫. 'মনের জোর জিহ্বায় যত সহজে সঞ্চারিত হয় অন্য সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তত সহজে হয়ে ওঠে না।' ('নাম')

৬. 'জরা মৃত্যুরও বাড়া।' ('বীতশোক')

৭. "..... সত্যিকারের কাজটাই কি সব? কথার জোর তার চেয়ে অনেক বেশী। কথা যেন অন্তরীপের মত ভবিষ্যতের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে যায়।" ('একটি ফুলকে ঘিরে')

৯. "সময় কি সত্যিই বদলায় - না মানুষের পরিবর্তনে সময় বদলানো মনে হয়? ..... না, সময় ঠিক এক রকমই থাকে বোধ হয়। বদলায় কেবল মানুষ - মনে আর ব্যবহারে।" ('যৌথ')

১০. "কিন্তু মানুষ যে একই কথা চিরদিন বলবে তার কি মানে আছে; একেক সময় যদি তার একেক কথা মনে আসে তা সে বলবে বই কি।" ('যৌথ')

১১. 'শ্রেণী-সংগ্রামের মত স্বজন-সংগ্রামও ব্যক্তিগত জীবনে তীব্র আর মর্মঘাতী।' ('একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান')

১২. 'সব দুঃখ মানুষকে মহৎ করে না। কোন কোন আঘাত মনুষ্যত্বকে চূর্ণ করে দেয়।' ('ভিন্নপথে')

উল্লেখপঞ্জি

১. সূত্র - দিবাকর মিত্র ঃ 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্মৃতিচারণ', 'প্রসঙ্গঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ১২.

২. চণ্ডী লাহিড়ী ঃ 'লাজুক নরেন্দ্ররনাথ', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ২২.

৩. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১০০.

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প থেকে যে সকল পংক্তি উদ্ধার করা হয়েছে সে সকল অভিজিৎ মিত্র সম্পাদিত ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিশোর গল্প সমগ্র থেকে গৃহিত।